গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১৪ সংখ্যা | ১৫ - ২১ নভেম্বর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

জনসমুদ্রে উঠেছে জোয়ার

জনজোয়ারে ভাসল কলকাতার রাজপথ

১৩ নভেম্বর, ভেসে এল এক দৃপ্ত প্রশ্ন— জনজীবনের হাজারো সংকটের সমাধানের দাবিতে লাগাতার লড়াইয়ের ক্ষমতা আছে কার? পাশ-ফেল প্রথা নিয়ে এক ধাপ মাথা নিচু করেছে সরকার, এবার তা প্রথম শ্রেণি থেকেই ফিরিয়ে আনার লড়াইটা করবে কে? কার শক্তি আছে? এনআরসির মাধ্যমে নাগরিকদের জীবন নিয়ে যেন খেলা করতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার— কে রুখে দাঁড়াবে? মদ-মাদকের নেশায় শেষ হয়ে যাচ্ছে দেশের শত সহস্র ছাত্র যুবক, সরকারের মদের প্রসার নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে কে? কে পারে? এমএলএ-এমপি-মন্ত্রী নিয়ে ক্ষমতার মসনদে আসীন কিংবা তার জন্য ভোটের খেয়োখেয়িতে ব্যস্ত বড় বড় দল করতে পারবে এ কাজ? কলকাতার হেদুয়া পার্কের সামনে সমবেত হাজার হাজার মানুষের গর্জন ভেসে এল— না। সমাবেশ মঞ্চ থেকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, তাহলে পারে কে? উত্তর এল— পারে একমাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা পাথেয় করে এগিয়ে চলা রাজনৈতিক দল এস ইউ সি আই (সি), আর তার সাথে পারে সচেতন জনগণ।

এস ইউ সি আই (সি) ডাক দিয়েছিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

অযোধ্যা রায় ন্যায়বিচারের চরম প্রহসন

বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টের ৯ নভেম্বরের রায় প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রভাস ঘোষ ১০ নভেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

মন্দির-মসজিদ বিরোধে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় সহ যে কোনও কাজ বা ঘটনাকে সঠিক ভাবে বিচার করতে হলে আবেগমুক্ত মন এবং ইতিহাসনির্ভর, বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার আগে কিছু প্রশ্ন গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার।

দুয়ের পাতায় দেখুন

অযোধ্যা রায়, ন্যায় বিচারের চরম প্রহসন

একের পাতার পর

১) অতীতকালে মহর্ষি বাল্মিকী তাঁর কাব্যগ্রন্থে রামকে ঈশ্বরের অবতার বলে দেখান। এ-ও বলা হয়ে থাকে যে, রামের জন্মের বহু আগেই বাল্মিকী তাঁর মহাকাব্যে রামের জন্মের কথা বলেছেন এবং রাজা দশরথের রাজপ্রাসাদকে জন্মস্থান হিসাবে দেখিয়েছেন, পরবর্তী কালে যেখানে বাবরি মসজিদ নির্মিত হয় সেই স্থানকে দেখাননি।

২) বাবরি মসজিদ নির্মিত হয় ১৫২৮ সালে। সেই সময় কেউই এই স্থানটিকে রামের জন্মস্থান বলে দাবি করে কোনও আপত্তি তোলেননি। এমনকী কবি তুলসীদাস, যিনি ১৫৭৪-৭৫ সালে রামচরিতমানস লিখে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রামকে জনপ্রিয় করেছেন, তিনিও রামচরিতমানসে কোথাও বলেননি যে, রামের জন্মস্থানেই ওই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

৩) চৈতন্য, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের মতো হিন্দু ধর্মের শ্রদ্ধেয় প্রবক্তারা কখনওই কোথাও এ কথা বলেননি যে, রামের জন্মস্থানেই বাবরি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। বিবেকানন্দ এমনকি রামের ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।

৪) তিনশো বছর ধরে কোনও বিসংবাদ ছাড়াই বাবরি মসজিদের অস্তিত্ব থাকার পর ব্রিটিশ শাসনে ১৮৮৫ সালে কিছু হিন্দু পুরোহিত এ নিয়ে বিতর্ক তোলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট বা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেননি। সিপাহি বিদ্রোহের পর হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধানোর জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ওই বিতর্ক বা বিরোধ উত্থাপন করতে মদত দেয়।

৫) ওই স্থানে নমাজ পাঠ বন্ধ করার জন্য ১৯৪৯ সালে রাতের অন্ধকারে মসজিদ প্রাঙ্গণে গোপনে রামের মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতা ও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরির লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৬ সালে মসজিদের পিছন দিকের বন্ধ দরজা খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কংগ্রেসের ভোট রাজনীতির পাল্টা হিসাবে এবং হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক পুরো দখলের উদ্দেশ্যে বিজেপি-সংঘ পরিবার ১৯৯০ সালে রামরথযাত্রা সংগঠিত করে, যা সারা দেশে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালায় এবং তারাই ১৯৯২ সালে ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করে দেয়।

৬) বর্তমান অযোধ্যার পুরাতাত্ত্বিক অতীত সম্পর্কে পাওয়া তথ্যাদি নিয়ে পুরাতত্ত্ববিদদের মধ্যেই মতপার্থক্য রয়েছে। এমনকি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের যে বিশেষ রিপোর্টটির উপর নির্ভর করে সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের রায় দান করেছেন বলে বিচারপতিরা জানিয়েছেন, সেই বিশেষ রিপোর্টের দ্বারাও এ কথা প্রমাণ হয় না যে, ওটা রামের জন্মস্থান ছিল এবং তার উপরই অভিযোগ অনুযায়ী মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তা ছাড়া অতীতে বহু এ ধরনের কাঠামো যত্রতত্র ছিল যার সবগুলিই কালক্রমে মাটির নিচে চলে গিয়েছে। কখনও খননের সময় এইসব কাঠামোর কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং তখন তাদের সম্পর্কে বহু রকমের পুরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়। এমনকি এরকম প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে, বহু বৌদ্ধ মন্দির ও স্তূপকে ধ্বংস করে সেখানে হিন্দু মন্দির বানানো হয়েছিল। এর ভিত্তিতে যদি কেউ এখন দাবি করে ওই সব হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলে সেখানে বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করতে হবে, তবে সেটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে?

৭) ১৯৪৯ সালে গোপনে রামমূর্তি বসিয়ে দেওয়া এবং ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, দুটিকেই সুপ্রিম কোর্ট বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে এবং এ কথাও বলেছে যে, কোনও মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। রায়ে এ কথাও বলা হয়েছে যে, 'শাস্ত্রের ব্যাখ্যাগুলো থেকে অসংখ্য সিদ্ধান্ত টানা যায়।' অথচ বিস্ময়কর ভাবে সিদ্ধান্ত করা হল যে, 'কোর্ট যদি একবার এমন কোনও প্রকৃত উপাদান পায় যার দ্বারা বোঝা যায় ওই বিশ্বাস বা আস্থা মেকি নয়, বরং যথার্থ, তবে ওই বিশ্বাসে পূজারীদের সম্মান জানাতে কোর্ট বাধ্য'। এ কথার উপরই নির্ভর করে তাঁরা রায় দিলেন যে, সমগ্র বিতর্কিত ভূখণ্ডই একটি ট্রাস্টের হাতে তুলে দেওয়া হবে, যাঁরা সেখানে রামমন্দির নির্মাণ করবেন এবং মুসলিমদের দেওয়া হবে মসজিদ তৈরির জন্য আলাদা পাঁচ একর জমি। এই রায় দেখে মনে হয় এ যেন সংঘ পরিবারের হাতে একটি পুরস্কার প্রদান এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি করুণা প্রদর্শন।

এই রায় স্বভাবতই বিজেপি এবং সংঘ পরিবারকে উৎফুল্ল করেছে এবং তারা ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো একটি জঘন্য কাজের আইনি ন্যায্যতা লাভ করল এই রায়ের দ্বারা। কিন্তু দেশের গণতন্ত্রপ্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে এই রায় অত্যন্ত উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে এবং ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা সম্পর্কে গভীর সংশয় সৃষ্টি করেছে।

আমরা মনে করি, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় আইনের সকল বিধি-বিধান এবং বিচার ব্যবস্থার সকল নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে কার্যত ন্যায়বিচারের চরম প্রহসন ঘটিয়েছে। আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে কোথাও কখনও ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ও আইনের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়নি। ফলে এই রায় ধর্মীয় উন্মাদনাকে উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও বিপজ্জনক নজির হয়ে থাকবে।

আমাদের এই বক্তব্যগুলিকে গভীর ভাবে বিবেচনা করে, গণতান্ত্রিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ ও বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতার উপর আক্রমণ প্রতিহত করা এবং জনগণের ঐক্য রক্ষা করার জন্য আমরা জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনিল বাউরী ১৮ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

সাতের দশকে রঘুনাথপুর কলেজে পড়ার সময় তিনি ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র মাধ্যমে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি কাশীপুর এলাকায় পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। দলের বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন ভদ্র, নম্র প্রকৃতির মানুষ। তাঁর আচার-আচরণে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। পারিবারিক জীবনে যৌথভাবে পরিবারকে পরিচালনার চেষ্টা করতেন যা এলাকার মানুষ আজও প্রশংসা করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দলের সাথে একাত্ম ছিলেন।

অনিলবাবু পেশায় ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক এবং বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আমৃত্যু সদস্য। জেলায় শিক্ষক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এলাকায় শিক্ষক মহলে তিনি ছিলেন একটি অতি পরিচিত নাম। তাঁর প্রয়াণে পার্টি একজন বিশিষ্ট কর্মীকে হারাল।

কমরেড অনিল বাউরী লাল সেলাম

পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি লোকাল কমিটির অন্তর্গত রাজাবাসা গ্রামের এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড শিবু কুইরি স্বল্পকাল রোগভোগের পর ৪ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

মৃত্যুর খবর পাওয়ার সাথে সাথে দলের কর্মী-সমর্থক সহ বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং শ্রদ্ধা জানান। জেলা কমিটির পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড সুবর্ণ কুমার ও লোকাল সম্পাদক কমরেড অজিত মাহাতো। কমরেড শিবু কুইরি সাতের দশকে দলের সাথে যুক্ত হন। ধীরে ধীরে দলের কাজে তিনি সক্রিয় হন এবং এলাকায় সংগঠন গড়তে এগিয়ে আসেন। আমৃত্যু তিনি দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরিবারের সকলকে দলের সাথে যুক্ত করেন। দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড শিবু কুইরি লাল সেলাম

দিল্লির আইনজীবীদের আন্দোলন সমর্থনে লিগাল সার্ভিস সেন্টার

১ নভেম্বর দিল্লির তিস হাজারি কোর্টে গাড়ি পার্কিং নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হয় আইনজীবীদের। তারপর হঠাৎ পুলিশ আইনজীবীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধর করতে শুরু করে। কোর্টের সর্বত্র এই খবর পৌঁছলে শত শত আইনজীবী ঘটনাস্থলে এসে পুলিশের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদ করতে থাকে। জনসাধারণও প্রতিবাদে সামিল হয়। কোনও রকম প্ররোচনা ছাড়াই পুলিশ হঠাৎ আইনজীবীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। বেশ কয়েকজন আইনজীবী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পরিচালিত পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয় কিছু পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করতে। তারপর যেভাবে পুলিশি বিক্ষোভ হয় তা দেখে মানুষের প্রশ্ন শাসক দলের মদত ছাড়া একি সম্ভব? এদিকে অত্যাচার, গুলি চালানো, মিথ্যা মামলার জন্য দায়ী পুলিশ আধিকারিকদের শাস্তির দাবিতে ৪ নভেম্বর তিস হাজারি কোর্ট সহ দিল্লির সমস্ত কোর্টে পেন ডাউন ও কর্মবিরতি পালন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লিগাল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলি এবং সভাপতি বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত দিল্লি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদককে ই-মেলে বার্তায় বলেন, দিল্লি পুলিশ ও প্রশাসনের আচরণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। আক্রান্ত আইনজীবী সহ সমস্ত আইনজীবীদের প্রতি এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনের প্রতি আমরা সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

কয়লা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিবাদে কনভেনশন

কয়লা শিল্পে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৮ নভেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কোলিয়ারি ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে পশ্চিম বর্ধমানের সরপী মোড়ে কয়লা শ্রমিকদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কোল মাইনার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার অন্যতম সংগঠক কমরেড অমর চৌধুরী এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য। বক্তারা কয়লা শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার হরণ করার কর্তৃপক্ষের ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন।

৬ বছরে দেশে চাকরি কমেছে ৯০ লক্ষ

আর্থিক সংকট, ঋণ, ছাঁটাই, কর্মহীনতায় জর্জরিত দেশের মানুষকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় বসে প্রতিশ্রুতি বিলিয়েছিলেন, বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি হবে। চাকরি হওয়া দূরের কথা, বেকারি পৌঁছেছে সর্বোচ্চ হারে।

একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮, এই ৬ বছরে ভারতে চাকরির সংখ্যা কমেছে অন্তত ৯০ লক্ষ। কর্মহীনতার এমন অধোগতি স্বাধীন ভারতে এই প্রথম। ২০১১-১২ সালে দেশে চাকরির সংখ্যা ছিল ৪৭ কোটি ৪০ লক্ষ। ২০১৭-১৮ সালে তা কমে হয়েছে ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ। কৃষি ক্ষেত্রে কাজ কমেছে সর্বাধিক হারে। অবস্থা আরও খারাপ অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সেখানে নোট বাতিল ও জিএসটি চালুর পর বন্ধ হয়েছে বহু ব্যবসা। কাজ চলে গিয়েছে অসংখ্য মানুষের। অল্পসংখ্যক যাঁরা কাজ পাচ্ছেন, তাঁদেরও অনেককে যোগ্যতার তুলনায় কম বেতনের কাজে ঢুকতে হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে শ্রম ক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহারও হচ্ছে না। অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেকারত্বের হার। এ বছরের অক্টোবরে ভারতে বেকারত্বের হার বেড়ে সাড়ে ৮.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। সেপ্টেম্বরের (৭.২ শতাংশ) থেকে ১.৩ শতাংশ বেশি। মার্কিন সংস্থা 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি' (সিএমআইই) ১ নভেম্বর তাদের প্রকাশিত রিপোর্টে এই উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করেছে।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সন্তোষ মেহরোত্রা ও পাঞ্জাবের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক যযাতি কে পরিদা-র ওই গবেষণাপত্রটি ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়মেন্ট-আনএমপ্লয়মেন্ট সার্ভে এবং পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের ভিত্তিতে এই রিপোর্টটি তৈরি করেন। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক অধ্যাপক হিমাংশু আগেই বলেছিলেন, ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত ভারতে প্রতি বছরে গড়ে ২৬ লক্ষ মানুষ চাকরি খুইয়েছেন।

যদিও তা স্বীকার করতে চাইছে না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই তথ্য চাপা দিতে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের তত্ত্বাবধানে আর একটি গবেষণার আয়োজন করা হয়েছিল কিছু দিন আগে। দু'ই অধ্যাপক লভীশ ভাণ্ডারি ও অমরেশ দুবে তাঁদের গবেষণাপত্রে দাবি করেছেন, গত ৬ বছরে ভারতে চাকরির সংখ্যা ৪৩ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৪৫ কোটি ৭০ লক্ষে পৌঁছেছে।

পরিসংখ্যান মন্ত্রকের বক্তব্য, নতুন পদ্ধতিতে কর্মসংস্থানের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই আগের হিসেবের সঙ্গে বেকারত্বের বর্তমান হারের তুলনা করা ঠিক নয়। নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্য খোলসা করে তারা কিছু বলেননি। যদিও কিছুদিন আগে তামিলনাড়ুতে কয়েকশো ক্লার্ক পদে চাকরির জন্য জমা পড়া লক্ষাধিক আবেদনপত্র সরকারের কর্মসংস্থান বাড়ার দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার, স্নাতকোত্তর, এমবিএ, পিএইচডি-ও।

একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র বাজার সংকট মেটা দূরে থাক গভীর হচ্ছে। অন্যদিকে নোট বাতিলের পর নগদের অভাবে ভারতে ছোট শিল্প ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থা শুরু হয়েছিল তা কেটে যাওয়ার বদলে সংকট উত্তরোত্তর বাড়ছে। তাতে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি অনিবার্য। অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরাই বলছেন এ কথা। তাহলে প্রধানমন্ত্রীর অঢেল চাকরির প্রতিশ্রুতি কেন? কারণ, তিনি ও তাঁর দল বিজেপি আর পাঁচটা বুর্জোয়া দলের মতো মনে করে, ক্ষমতার কুর্সি দখল করতে সাধারণ মানুষকে (অধিকাংশ ভোটদাতা) বোকা বানাতে হবে। তার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসিয়ে দাও গোটা দেশকে। তারপর জিতে এসে একের পর এক শ্রমিক স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নাও, মালিকদের সেবায় সরকারি কোষাগার উজাড় করে দাও ষোলো আনা, সাধারণ মানুষের দিকে কখনও-সখনও এক আনা ছুঁড়ে দাও— এভাবে পাঁচ বছর নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দাও। আবার নির্বাচন এলে মুখে সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ দেখিয়ে জনসভায় তাদের দুঃখে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে, তাদের ভালো করার প্রতিশ্রুতি দাও আবার। এভাবে মানুষের অসহায় অবস্থাকে পুঁজি করে ভোটের বৈতরণী পার হয়ে যাও বছরের পর বছর। তাতে বেকার যুবকরা চাকরি পেল কি পেল না, কতজনের চাকরি চলে গেল, ছাঁটাই হল কত শ্রমিক— তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই।

বিলগ্নিকরণ রুখতে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্মীরা রাস্তায়

বাজেট ঘাটতি কমানোর নামে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ করেই চলেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এ বছরের বাজেটে বিলগ্নিকরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন এক লক্ষ পাঁচ হাজার কোটি টাকা। এই বিলগ্নিকরণের খাঁড়া যে সমস্ত সংস্থার উপর নেমে আসতে যাচ্ছে তাদের অন্যতম ভারত পেট্রোলিয়াম কোম্পানি (বিপিসিএল)। চাকরি হারানোর আশঙ্কায় সংস্থার কর্মীরা ইতিমধ্যেই এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন এবং দাবি তুলেছেন, বিলগ্নিকরণ বন্ধ কর।

বিলগ্নিকরণের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশের মানুষকে অন্ধকারে রাখতে সাধারণত একটা ধুয়া তোলা হয় যে, অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বা লোকসানে চলা রাষ্ট্রীয় সংস্থা চালিয়ে যাওয়ার অর্থ, সরকারি অর্থের অপচয়। এগুলো চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে বেচে দেওয়াই ভাল। তাতে সরকারের অর্থ বাঁচবে। এটা যে কত বড় মিথ্যা, তার একটা বড় উদাহরণ বিপিসিএল বিলগ্নিকরণ।

ভারত সরকার যে ৮টি সংস্থাকে 'মহারত্ন' সংস্থা বলে ঘোষণা করেছে, বিপিসিএল তার অন্যতম। ভারতের সমস্ত শিল্প-সংস্থার মধ্যে এর স্থান ছয় নম্বরে। গোটা বিশ্বের অগ্রগণ্য শিল্পসংস্থাগুলির যে তালিকা আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা 'ফরচুন' তৈরি করেছে, সেখানে প্রথম ৩০০টি মধ্যে বিপিসিএলের স্থান ২৭৫তম। তেল ও গ্যাস নিয়ে এর ব্যবসা। ভারতের চারটি জায়গায় এর শোধনাগার আছে। কোচি, মুম্বই, বীণা (মধ্যপ্রদেশ) ও নিউমালিকায় (আসাম)। বীণার তেল শোধনাগারটি চলে ওমান তেল কোম্পানির সঙ্গে যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে। গোটা ভারত জুড়ে এদের নেটওয়ার্ক। দেশের তেল উৎপাদনের ২৪ শতাংশ রয়েছে বিপিসিএল-এর হাতে। এদের এল পি জি কানেকশন গ্রাহক সংখ্যা ৬.৮ কোটি। গোটা দেশে এদের ডিপো ও পাম্পের সংখ্যাও অসংখ্য। বোম্বে হাই-এর তৈলক্ষেত্রের কাজ এরাই শুরু করে। গত পাঁচ বছরে এদের শোধনাগারগুলিতে ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পর এদের বাৎসরিক তেল উৎপাদন ক্ষমতা ২.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বেড়ে বর্তমানে ১৫.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হয়েছে। ২০১৭-'১৮ সালে এদের নিট লাভের পরিমাণ ছিল ৮,৫২৭ কোটি টাকা। তা হলে, এরকম একটা লাভজনক সংস্থাকে কোন যুক্তিতে বিলগ্নিকরণ ঘটানো হচ্ছে?

ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সমীক্ষা করে বিপিসিএল-এর বিক্রয় মূল্য ধার্য করেছে ৫৬ হাজার কোটি টাকা। যে সংস্থার নিট লাভ বছরে ৮৫২৭ কোটি টাকা, অপারেটিং লাভ ১১৯৬৮ কোটি টাকা, ২০১৯ সালে যার মোট সম্পদের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৩০ কোটি টাকা। তার বিক্রয়মূল্য ৫৬ হাজার কোটি টাকা কী করে হয়?

২০১৭ সালে ইমার অয়েল কোম্পানি গুজরাটে তাদের একটিমাত্র তেল শোধনাগার রাশিয়ার একটি তেল কোম্পানি রুফ নেটফ্লিক্সকে বিক্রি করে দেয় ১২.৯ বিলিয়ন ডলারে। ভারতীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। বিপিসিএল-এর মোট সম্পদ এর দশ গুণেরও বেশি। তা হলে তার দাম ৫৬ হাজার কোটি টাকা হয় কী করে? প্রশ্ন উঠেছে, কোন অদৃশ্য হাতের খেলা এর পিছনে কাজ করছে?

বিপিসিএল-এর ৫৩.২৯ শতাংশ শেয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে। তা বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় স্বভাবতই বিপিসিএল-এর কর্মীরা গভীর উদ্বিগ্ন। বিপিসিএল-এর মোট কর্মী সংখ্যা ১২ হাজার ১৫৭। এ ছাড়াও রয়েছে আরও ২৭ হাজার ঠিকা কর্মী যাঁরা এদের তেল শোধনাগারগুলিতে নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত। এদের ৪টি মূল শোধনাগারের মধ্যে কেরালার কোচি ইউনিটটিই সবচেয়ে বড়। স্বাভাবিকভাবেই এই রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি বেচে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেখানে তীব্র প্রতিবাদ দানা বেঁধেছে। তাছাড়া কোচি রিফাইনারি সম্প্রসারণের কাজ চলছে। ৪০ হাজার কোটি টাকায় এই প্রকল্পের জন্য ১৭৬ একর জমি নেওয়া হয়েছে। আরও ৪৬০ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। ফলে অনেকেই আশায় ছিলেন, এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সরকারের বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত এই আশায় জল ঢেলে দিল শুধু তাই নয়, কর্মীদের জীবিকাকেও একটা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। এই সংস্থা বেসরকারি মালিকের হাতে চলে গেলে কত জনের চাকরি থাকবে? এই উদ্বেগ থেকে বিপিসিএল-এর কর্মীরা ইতিমধ্যেই প্রতিবাদে নেমেছেন। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস জুড়ে আন্দোলনের নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বিপিসিএল বিলগ্নিকরণ ও বেসরকারিকণের বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্রতর করতে এর্নাকুলাম জেলায় গঠিত হয়েছে যুক্ত সংগ্রাম কমিটি। এতে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিরাই রয়েছেন।

কোচি ছাড়া বিপিসিএল-এর অন্য শোধনাগারের কর্মীরাও আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আশঙ্কা ও উদ্বেগ বাড়ছে ইন্ডিয়ান অয়েল (আইওসিএল), অয়েল ইন্ডিয়া, ওয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস করপোরেশন (ওএনজিসি), হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম (এইচপিসিএল) -এর মতো অন্যান্য তেল কোম্পানিগুলির শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যেও। এঁদের সবাইকে নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে ইতিমধ্যেই একটি জাতীয় কনভেনশন মুম্বইতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কনভেনশন থেকে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। শুধু তেল কোম্পানিগুলিই নয়, রেলেও বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া চলছে। সেখানেও কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কাজ হারানোর আশঙ্কায় দিন গুনছেন। আশঙ্কায় রয়েছেন অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীরাও।

আজ পুঁজিপতিদের স্বার্থে যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ ঘটানো হচ্ছে, সেগুলো একটা সময় এ দেশের সরকার গড়ে তুলেছিল এ দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থেই। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে এ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য এইসব মূল ও ভারী শিল্পগুলি ছিল অপরিহার্য। অথচ ব্যক্তি পুঁজিপতিরা সেদিন এখানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী ছিল না। কারণ এর জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল অংকের পুঁজি। তা ছাড়া তাদের চাই চটজলদি লাভ। এই ধরনের শিল্পে বিনিয়োগ করে লাভের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়। শিল্পপতিদের হয়ে এই কাজটা সেদিন করে দিয়েছিল তাদেরই বশংবদ সরকার। এটাই ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাস।

আজ আবার চিত্রটা সম্পূর্ণ উল্টো। আজ পুঁজির মালিকদের হাতে রয়েছে বিশাল পুঁজি। কিন্তু তা খাটাবার জায়গা নেই। কারণ বাজার নেই। বাজার নেই কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বলে কিছু নেই। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি ধুঁকছে। অর্থনীতিতে মন্দা। এই মন্দা মোকাবিলার নামে কেন্দ্রে তাদের সেবাদাস বিজেপি সরকার যেমন একদিকে করপোরেট মালিকদের জন্য সরকারি ভাণ্ডার উজাড় করে দিচ্ছে, করপোরেট ট্যাক্স কমিয়ে দিচ্ছে, এদের অনাদায়ী ঋণ ব্যাঙ্কের খাতা থেকে মুছে দিচ্ছে, তেমনি একদিন সরকারের হাতে থাকা লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিও বাজারদরের চেয়ে অনেক কম দামে তুলে দিচ্ছে এদের হাতে। শিল্প-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ-যোগাযোগের মতো অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রগুলিও এদের সামনে খুলে দেওয়া হচ্ছে। এটাই হল বিলগ্নিকরণের পিছনকার ইতিহাস। যা শুরু করেছিল কংগ্রেস ১৯৯১ সালে।

কংগ্রেসের পথ অনুসরণ করেই বিজেপি বিলগ্নিকরণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ২০১৩-'১৪ সালে কংগ্রেস রাজত্বের শেষ বছর বিলগ্নিকরণের পরিমাণ ছিল ১৫৮১৯ কোটি টাকা। আজ তা লক্ষ কোটি টাকার সীমা ছাড়িয়েছে। মোট ৩৩১টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মধ্যে ২৫৭টিতেই এই প্রক্রিয়া চলছে। তথ্য বলছে, যে ২৫৭টি সংস্থায় বিলগ্নিকরণের প্রক্রিয়া চলছে সেখানে ২০১৬-'১৭ সালে নিট লাভের অংক ছিল ১২৭৬০২ কোটি টাকা। যা আগের বছরের চেয়ে, ১৩৩৬৩ কোটি টাকা বেশি। এই বিজেপিই অটলবিহারী বাজপেয়ীর শাসনকালে (১৯৯৯-২০০৪) ভিএসএনএল, আইপিসিএল (ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যালস), ভারত অ্যালুমিনিয়াম, হিন্দুস্তান জিংকের মতো সংস্থা টাটা, আম্বানিদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। আজ তারা অনেক বেশি বেপরোয়া। একে রুখতে হলে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

রাউরকেলায় ইস্পাত শ্রমিক সম্মেলন

৩ নভেম্বর ওড়িশার রাউরকেলায় ইস্পাত শ্রমিক সংগঠন এফআইএসডব্লিউ-র তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি তথা এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত, কমরেড মোহন চৌধুরী প্রমুখ। দুর্গাপুর, বার্নপুর, রাউরকেল্লা, বোকারো, নীলাচল ইস্পাত নিগম, জিন্দাল-ভূষণ-টিস্কো প্রভৃতি প্ল্যান্ট থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

পুলিশের অপকর্ম ঢাকতে কালা আইন গুজরাটে

সন্ত্রাসবাদ এবং সংগঠিত অপরাধ দমনের নামে গুজরাট সরকার অত্যন্ত দানবীয় একটি কালা আইন সম্প্রতি গ্রহণ করেছে। গত ১৬ বছরে তিনবার বিলটিকে ক্রমাগত দানবীয় করা হয়েছে। এই আইনে রাজ্যের পুলিশকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে 'সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধ' দমন করতে পারে। এস ইউ সি আই (সি) গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশী এক বিবৃতিতে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের এই আইনের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'এর প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণের আন্দোলন এবং সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দমন করা। তিনি এই কালা আইনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চেতনার মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

'পেহলু খান নির্দোষ', কিন্তু খুনিরা!

এ কেমন শাসন! এ জিনিস কোনও সভ্য সমাজে ঘটতে পারে? যে মানুষটিকে পিটিয়ে মেরে হিন্দুত্ব এবং গো-মাতাকে রক্ষার ধ্বজা ওড়াল বিজেপি-সংঘ পরিবারের গো-রক্ষকরা, যার খুনিরা পুলিশের কারসাজিতে ছাড়া পাওয়ার পর তাদের রীতিমতো বীরের সংবর্ধনা দিল হিন্দুত্ববাদী নেতারা— ৩০ অক্টোবর রাজস্থান হাইকোর্টের রায় বলেছে সেই খুন হওয়া পেহলু খান গোরু পাচারকারী নন, তিনি দুধ ব্যবসায়ী। গোহত্যা দূরে থাক, তিনি সযত্নে গো-পালন করেছেন। মৃত্যুর পর নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার কোনও সুফল পৌঁছতে পারল না পেহলু খানের কাছে!

২০১৭ সালের এপ্রিলে জয়পুর থেকে গরু কিনে হরিয়ানা ফেরার পথে জয়পুর-দিল্লি জাতীয় সড়কে গো-রক্ষকদের হামলার মুখে পড়েন দুধ ব্যবসায়ী পেহলু খান ও তাঁর দুই ছেলে। গরু কেনার রসিদ দেখিয়েও গো-রক্ষকদের হাত থেকে রেহাই পাননি তাঁরা। আক্রান্ত হন গরু বহনকারী ট্রাকের চালকও। দু'দিন পর মারা যান পেহলু খান। তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দি অনুযায়ী ৮ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে বাধ্য হয়েছিল রাজস্থান পুলিশ। পরে নিম্ন আদালতে ছাড়া পেয়ে যায় অভিযুক্তরা।

প্রশ্ন ওঠে, অপরাধ করেও কী করে ছাড়া পেয়ে গেল অভিযুক্তরা, আর পেহলু খানদের বিরুদ্ধে গোরু-পাচার ও গো-হত্যার মিথ্যা মামলা চলতে থাকল? মামলা সাজানোর সময় বিজেপি ছিল রাজস্থানের মসনদে। বিজেপি সরকার খুনিদের বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা করেছে, এ কথা স্পষ্ট।

কিন্তু সরকার বদলের পর কংগ্রেস সরকারও কি বিজেপির মতো দুষ্কৃতীদের মদত দিচ্ছে না? না হলে তারা কেন খুনিদের শাস্তির জন্য কোনও রকম চেষ্টা করল না! অবশেষে রাজস্থান হাইকোর্ট বলেছে— সমস্ত তথ্যপ্রমাণে স্পষ্ট গরুগুলি গোমাংসের জন্য নয়, দুধের ব্যবসার জন্যই কিনেছিলেন পেহলুরা। আদালতকে বলতে হয়েছে, আইনের অপব্যবহার করেছে সরকার। আজ পেহলু খানের খুনিদের চরম শাস্তি চাইবে না কেন দেশ? একটা মানুষের প্রাণ ওরা কেড়ে নিয়েছে শুধু ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে জিগির তোলার জন্য। যাদের নির্দেশে এ কাজ হয়েছে, তারা আজও দেশের মসনদে। সেই হিন্দুত্ববাদের চ্যাম্পিয়ন নেতা-মন্ত্রীদের কেন কঠোর শাস্তি হবে না?

উত্তরাখণ্ডে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল জেলার শ্রীনগরে ২০-২১ অক্টোবর শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। দর্শনগত ও রাজনৈতিক নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ধুর্জটি দাস ও কমরেড প্রতাপ সামল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ইনচার্জ কমরেড মুকেশ সেমওয়াল।

পরিচারিকাদের প্রীতি সম্মেলন

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির উদ্যোগে ২০ অক্টোবর মেদিনীপুর শহরে পরিচারিকা মা-বোনেদের প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভবানী চক্রবর্তী এবং সমিতির সভানেত্রী লিলি পাল। পরিচারিকাদের জীবন সংগ্রামের নানা দিক উঠে আসে। একই দিনে ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম শহরে নীতিকণা মাইতির পরিচালনায় ও ২১ অক্টোবর খড়গপুর শহরে পরিচারিকা মা-বোনেদের অনুরূপ প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা লেনিনের নেতৃত্বে ৭-১৭ নভেম্বর রাশিয়ার বুকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলারা সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে করে তুলেছিল আরও সুজলা-সুফলা ও উর্বর। বিজ্ঞান-সাহিত্য-খেলাধূলা-মহাকাশ অভিযান প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বের মধ্যে নজির সৃষ্টি করেছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। বিশ্বের দেশে দেশে মেহনতি মানুষ এই 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' নিজেদের সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে শপথ নেওয়ার দিন হিসাবে পালন করেন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় অফিসে ৭ নভেম্বর পতাকা উত্তোলন ও মহান নেতা লেনিন-স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতাদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীও হয়।

পেঁয়াজের দাম ৮০ টাকা

কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই নীরব দর্শক

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে পেঁয়াজের দাম হয়েছিল ৮০ টাকা কেজি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনে পেঁয়াজের দাম ৮০ টাকা ছুঁল। অগ্নিমূল্য পেঁয়াজের ঝাঁজ বাজপেয়ী সরকারের পরাজয়ের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল। নরেন্দ্র মোদির সৌভাগ্য, তাঁর শাসনে দাম বাড়ল ভোটের পর।

শীত আসতে চলেছে। এই সময়ে সবজির দাম কমার কথা। কিন্তু গত একমাস ধরে দাম বেড়েই চলেছে। আলু থেকে সবজি সব কিছুর দাম আকাশ ছোঁয়া। এই দামের অর্ধেকও কৃষকরা পাচ্ছেন না। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা কৃষকদের কাছে থেকে নামমাত্র মূল্যে কিনে যেমন খুশি দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছে। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার এই মর্ধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে যে আইনগুলি রয়েছে সেগুলিও প্রয়োগ করছে না কোনও সরকার।

পেঁয়াজের এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ বলছেন, ভারী বৃষ্টির জন্য নাসিক, কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানায় উৎপাদন মার খেয়েছে। তাই দামবৃদ্ধি। বাস্তবে এই পিঁয়াজ বড় বড় ব্যবসায়ীরা চাষিদের থেকে জলের দামে কিনে গুদামজাত করেছিল। তাই এখন চড়া দামে বেচছে। তা ছাড়া বাজারে তো পেঁয়াজ মিলছে। তা হলে উৎপাদনে ঘাটতি কোথায়? যদি ঘাটতি হয়েও থাকে প্রয়োজনে বিদেশ থেকে অতি দ্রুত আমদানি করে চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। সরকার কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে? এসইউসিআই(সি)-র দাবি অবিলম্বে খাদ্যপণ্যের দাম কমাতে হবে। খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এসইউসিআই(সি) বরাবরই পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু পূর্বতন কংগ্রেস সরকার, সিপিএম সরকারের মতো বর্তমান তৃণমূল সরকারও এই গুরুত্বপূর্ণ দাবি কার্যকর করছে না খাদ্যব্যবসায়ীদের স্বার্থে। বিজেপি সরকারের ভূমিকাও তাই। মূল্যবৃদ্ধির আগুনে জ্বলছে মানুষ, সরকার নীরব দর্শক।

ডেঙ্গু প্রতিরোধের দাবি, কলকাতা ও বিধাননগরে বিক্ষোভ

বিধাননগর পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সল্ট লেক সহ বাগুইআটি, কেষ্টপুর, যাত্রাগাছি প্রভৃতি এলাকায় বহু মানুষ প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছেন। অবিলম্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ৬ নভেম্বর বিধাননগর মেয়রের উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এস ইউ সি আই (সি) রাজারহাট এবং সল্ট লেক আঞ্চলিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে (ছবি)। নেতৃত্ব দেন পার্টির সল্ট লেক ও রাজারহাট আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক যথাক্রমে কমরেড স্নেহাশীষ দাস ও কমরেড জগন্ময় কর্মকার। এছাড়া ১ নভেম্বর কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়রের দপ্তরে ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেয়।

কলকাতা সেদিন মিছিলনগরী

(উপরে) মিছিলের সামনের সারিতে নেতৃবৃন্দ। (উপরে ডানদিকে) কলেজ স্ট্রিট মোড়ে মিছিলকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এলেন পুস্তক বিক্রেতা সমিতি, স্ট্রিট হকার্স অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। (নিচে ডানদিকে) হেদুয়ায় মিছিল শুরুর আগে সমাবেশের একাংশ

আর্থিক নীতি বিরোধী গণবিক্ষোভে আর্জেন্টিনায় সরকারের পতন ঘটল

বিশ্বায়ন-উদারিকরণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে আর্জেন্টিনায় সদ্য অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি মাউরিসিও মাকরিকে হারিয়ে দিলেন অ্যালবার্টো ফার্নান্ডেজ। ফার্নান্ডেজ মডারেট বামপন্থী 'পেরনবাদী' দলের প্রতিনিধি। অন্যদিকে মাউরিসিও মাকরি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতি ঘনিষ্ঠ এবং আই এম এফ অনুগত।

কেন আর্জেন্টিনার জনগণ উদারিকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সরকার বদলে দিল? কারণ মাকরি শাসন দেশকে গণঅনাহারের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, ডুবিয়ে দিয়েছে ঋণের জালে। দারিদ্র, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সমস্যা মানুষকে এত জর্জরিত করে তুলেছে যে, মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতায় নয়া উদার অর্থনীতিকে তুলনা করছে বর্বরতার সাথে। দৃশ্যত উদারিকরণ এ সব সমস্যার জন্য দায়ী হলেও সমস্যাগুলির উৎস পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এই অর্থনীতিকে তীব্র বাজার সঙ্কট থেকে খানিকটা বাঁচাতেই তথাকথিত উদার অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

বলা হয়েছিল প্রত্যেক দেশেই প্রত্যেক দেশের পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করতে পারবে। বলা বাহুল্য, এই মুক্ত দরজা দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই ঢুকেছিল। তারাই তুলনামূলকভাবে দুর্বল দেশগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজির শোষণ কায়েম করে দেশগুলিকে ছিবড়ে করে দিয়েছে।

নয়া উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশ্বজুড়েই। শুধু আর্জেন্টিনা নয়, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে নয়া উদার আর্থিক নীতি বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে। চিলি, ইকুয়েডর, ব্রাজিলের মানুষও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। বাস্তবে উদারনীতিবাদ পুঁজিপতিদের প্রতি উদার, কিন্তু জনগণের প্রতি নিষ্ঠুর।

প্রবল জনসমর্থন নিয়ে মডারেট বামপন্থী ফার্নান্ডেজ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে নানা বাক্যবিন্যাসের আড়ালে একই পুঁজিবাদী উদারনীতি লাইন অনুসরণ করলে এই সরকারও জনাদেশের মূল্য দিতে ব্যর্থ হবে। সরকার বদলেই আটকে যাবে উদারনীতিবাদ বিরোধী বিক্ষোভ।

উদারনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের অভিমুখ পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও শাসন ব্যবস্থার অবসানের উদ্দেশে পরিচালিত না হলে এ আন্দোলন অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। আর এই লক্ষ্যে আন্দোলনকে নিয়ে যেতে হলে যথার্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চর্চা ছাড়া হতে পারে না

বিশ্বভারতীতে আধাসেনা বিক্ষোভ ডিএসও-র

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে আধাসেনা বাহিনী সিআইএসএফ মোতায়েন করেছে কর্তৃপক্ষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন ছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে মুক্তচিন্তার অঙ্গন। তাঁরই স্মৃতি বিজড়িত বিশ্বভারতীতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তাবাহিনী (সিআইএসএফ) মোতায়েন করেছে ছাত্রদের প্রতিবাদী সত্তা গায়ের জোরে দমন করার জন্য।

এআইডিএসও এর বিরুদ্ধে একেবারে প্রথম দিন থেকেই আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ১১ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উপস্থিত হলে অবস্থান-বিক্ষোভ করে প্রতিবাদ জানায় এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে সংগঠন খোলা চিঠি প্রকাশ করেছে।

ওই দিন বিশ্বভারতীর স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে অবস্থান মঞ্চে পুলিশ হামলা চালায়। জোর করে অবস্থান ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে। না পেরে তিন ঘন্টারও বেশি সময় তারা ছাত্রছাত্রীদের ঘেরাও করে রাখে। এই পুলিশি হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সংগঠনের বিশ্বভারতী লোকাল কমিটি সম্পাদক রিয়া গড়াই অবিলম্বে আধাসেনা বাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলে নেওয়ার দাবি জানান।

সংগ্রহ করুন

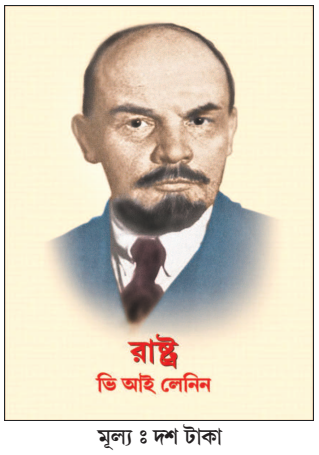

মূল্য ঃ দশ টাকা

জনজোয়ারে ভাসল কলকাতার রাজপথ

একের পাতার পর

কলকাতায় রাজ্য সরকারের সদর দপ্তর নবান্ন অভিযানের। একই দিনে শিলিগুড়িতে হয়েছে উত্তরকন্যা অভিযান। কলকাতার হেদুয়া পার্কের সামনে সংক্ষিপ্ত সভার পর দৃপ্ত মিছিল এগিয়ে চলে নবান্ন অভিমুখে। কলকাতার রাজপথে সে এক জনজোয়ার। ২৫ হাজারের বেশি মানুষের মুখর স্রোতের ঢেউ আন্দোলিত করেছে চারপাশে দাঁড়ানো আরও কয়েক হাজার মানুষের মনকে। তাই দীর্ঘ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট যখন চলেছে মিছিল, বিরক্তি দূরে থাক বারে বারে ভেসে এসেছে মন্তব্য— এই মিছিলটার খুব দরকার ছিল।

মিছিলের দাবি, সরকার তুমি অনেক সময় ব্যয় করেছ, আর নয়— পাশ-ফেল অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকেই ফেরাও। দাবি— বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গেও মদ নিষিদ্ধ করে দরিদ্র পরিবারগুলির শান্তি এবং হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রম রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দাবি উঠেছে বেকার যুবকদের কাজ দাও, বন্ধ কল-কারখানা খোল, সার-বীজ-কীটনাশক-ডিজেল,পেট্রলের দাম কমাও, চাষির ফসলের লাভজনক দামের ব্যবস্থা কর, চা-শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরি দাও, বিদ্যুতের দাম অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ কমাও, রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি কমানো চলবে না, চিটফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা কর। নাগরিকত্ব হরণের চক্রান্ত এনআরসি বাতিল কর।

হেদুয়ায় শুরু হয়ে মিছিল বিবেকানন্দ মোড় পেরিয়ে, বিধান সরণি হয়ে কলেজ স্ট্রিটে ঢুকতেই স্থানীয় বাসিন্দা, বই ব্যবসায়ী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সহ আরও অনেকে এগিয়ে এসেছেন, নেতৃবৃন্দকে ফুল দিয়ে, মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন পাশ-ফেল ফেরানোর আন্দোলনে জয়ের জন্য। সারা রাস্তা থেকে এসেছে মিছিলের পাশে দাঁড়ানো মানুষের সমর্থনের সুর। মিছিলে হাঁটা মানুষগুলিও নিছক হাঁটছে না, এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। তাদের চোখ-মুখের উজ্জ্বলতায় তার সাক্ষ্য। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার মাইসোরা অঞ্চলের শেখ মোজাফফর হোসেন বৃদ্ধ বয়সেও সোচ্চার স্লোগান দিতে দিতে চলেছেন। কেমন লাগছে? এল এক অসাধারণ উত্তর, এখানে এসে 'কুজা থেকে সোজা হয়ে গেছি'। '৬৭ সাল থেকে বহুদিন সিপিএম করেছেন, 'নীতির জন্য লড়াই আমার, তাই ওদের ত্যাগ করে এই মিছিলে আমি'। বললেন, 'জালেমের (অত্যাচারীর) বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ জাগ্রত জীবনের লড়াই চলবে। যতদিন লাগে লড়তে হবে। থামা চলবে না'। ডিগডিগে রোগা শরীরে মাথায় একটা ভারি ব্যাগ, তাও হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছেন পুরুলিয়ার চাটুমাদারের গৈরি মাহাতো। স্বামী তৃণমূলের নেতা, বাড়িতে ফিরে অশান্তি হতে পারে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই— যা ঠিক তা করতে হবেই। বাঁকুড়ার সারেঙ্গার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্যের ঘরের ছেলেরাও মিছিলে। বাসন্তীর নির্মাণ কর্মীরা, কুলতলির মৎস্যজীবী, হাওড়ার শ্যামপুরের মিড ডে মিল কর্মী, নদীয়ার আশা কর্মী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার আইসিডিএস কর্মী, সারা রাজ্যের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, উকিল ডাক্তার শিক্ষক, ছাত্র-যুব, গৃহবধূ— কে নেই মিছিলে! বাঁকুড়া জেলার বেশ কিছু জন, পরিচারিকার কাজ করেন তাঁরা এসেছেন শিশু কোলে নিয়ে। কেন মিছিলে জানতে চাইলে বললেন, এই দল আমাদের পাশে সবসময় থাকে। আর মহিলাদের দাবি নিয়ে তো এরাই লড়াই করে। আমরা তাই কাজ থেকে ছুটি নিয়ে রাত জেগে ট্রেনে চেপে এখানে এসেছি। হরিহরপাড়ার রিয়া সরকার, অন্নপূর্ণা পালমণ্ডলরা চান মুর্শিদাবাদ জেলায় মদের রমরমা, নারী পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই। হরিহরপাড়ারই লালন বানু, আসানারা বেগমরা এন আর সি-র মাধ্যমে দেশ থেকে মানুষ উৎখাত করার বিজেপির রাজনীতির প্রতিবাদ জানাতেই মিছিলে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা পেশায় বিড়ি শ্রমিক। ১০০০ বিড়ি প্রতি ১০৫ টাকা রোজগার করে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। তাই শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে। মিছিলে হাঁটতে গিয়ে খোঁড়াচ্ছেন দেখে এক স্বেচ্ছাসেবক জিজ্ঞাসা করেছেন এক বয়স্ক মানুষকে, আপনি পারবেন হাঁটতে? দৃঢ়চেতা মানুষটির উত্তর— 'আমাদের হয়ে কি অন্য কেউ হেঁটে দেবে? আমাকে পারতেই হবে'।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে আটকে আছেন বহু মানুষ। রাস্তা পার হতে তাঁদের দেরি হচ্ছে। কিন্তু অসন্তোষের লেশটুকুও নেই। বিধান সরণিতে দাঁড়ানো উমা গাঙ্গুলি তাই বলেন, এ মিছিল ন্যায্য মিছিল— এমন আরও হোক। বিবেকানন্দ রোডের মোড় পেরিয়ে বিধান সরণিতে এক দোকানের মালিক বলে উঠলেন, এটা যেমন তেমন মিছিল নয়, এক ব্যতিক্রমী মিছিল। হেয়ার স্কুলের ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রও তাই বলে— পাশ-ফেলের জন্য এই মিছিল খুব দরকার ছিল। আজকাল মিছিল মানেই যখন তাকে শুধু যানজট বলে চিহ্নিত করে বড় বড় সংবাদমাধ্যম, তখন কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে মিছিলের জেরে আটকে থাকা দোকানদার দেবকুমার বাবু বলছেন, আটকাক রাস্তা, হোক অসুবিধা, এই মিছিল আমাদের দরকার।

নানা জেলা থেকে এসেছে সুসজ্জিত ট্যাবলো। মিছিলের সামনে নেতৃবৃন্দ, আছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস অমিতাভ চ্যাটার্জী, শংকর ঘোষ, স্বপন ঘোষাল, মানব বেরা, অশোক সামন্ত, সুভাষ দাশগুপ্ত, ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ধূর্জটি দাশ সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ। হেদুয়া পার্কের সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, প্রাক্তন বিধায়ক এবং দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পুলিশ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সামনে মিছিল আটকে দিলে সেখানেই শুরু হয় সভা। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শঙ্কর ঘোষ, অমিতাভ চ্যাটার্জী এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও রাজ্য কমিটির সদস্য এ এল গুপ্তা।

প্রায় দু'মাস ধরে রাজ্য জুড়ে এই মিছিলের জন্য চলেছে নিবিড় প্রচার। হয়েছে অসংখ্য পথসভা, হাটসভা, পাড়া বৈঠক। মানুষ শুধু শুনেছেন তাই নয়, সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন। মধ্য কলকাতার ৭০ নম্বর বস্তিতে মানুষ যেমন কর্মীদের হাত থেকে পোস্টার কেড়ে নিয়ে নিজেরা লাগিয়েছেন। কলকাতারই হরিণবাড়ি লেনের উর্দুভাষী মানুষ কর্মীদের রাত জেগে পোস্টার মারতে দেখে এগিয়ে এসেছেন, এলাকায় মিটিং করার জন্য অনুরোধ করেছেন। বারুইপুরের মানুষ বলেছেন, থেমো না, ১৩ তারিখের পর ১৪ তারিখেই এলাকায় এসে যোগাযোগ কোরো, আমরা বসব। হাওড়ার বালি ঘোষপাড়া বাজারের মানুষ সোচ্চারে বলেছেন— এগুলিই জনগণের দাবি। প্রচার দেখে বহু জায়গায় মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসে ডেকে নিয়ে গেছেন মদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। পুরুলিয়ার আড়শায় এই প্রচার চলতে চলতেই প্রায় ৭০০ মহিলা মদ বিরোধী বিক্ষোভে সামিল হয়ে বিডিওতে ডেপুটেশন দিয়েছেন। মানুষ বলেছে এনআরসির সর্বনাশা পরিকল্পনা রুখতে এস ইউ সি আই (সি)-র বক্তব্য সঠিক এবং অবস্থান বলিষ্ঠ। আন্দোলনে এরাই একমাত্র ভরসা।

হার মেনেছে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও

১৩ নভেম্বর তাই ডাক দিয়ে গেল আন্দোলনের এক নতুন ধাপের। এ আন্দোলন চলবে। আন্দোলন যেমন দাবি আদায়ের একমাত্র রাস্তা, একই সাথে আন্দোলনই শেখায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে। বাঁচিয়ে রাখে মনুষ্যত্বের দীপশিখা। দেখায় মুক্তিপথের দিশা।

ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় উপযুক্ত ত্রাণের দাবি এস ইউ সি আই (সি)-র

প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত এলাকার মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিল এস ইউ সি আই (সি)। ১১ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী কাকদ্বীপে গেলে দলের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার জানান— গত ৮-৯ নভেম্বরের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ও মুষলধারে বৃষ্টিতে জেলার সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, কুলতলি, মথুরাপুর ১ ও ২, মন্দিরবাজার, কুলপি, জয়নগর ১ ও ২, ডায়মণ্ডহারবার, মগরাহাট ১ ও ২, বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং ১ ও ২ ইত্যাদি ব্লকে চাষ ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে ধানের জমি ও পান চাষের ক্ষতি হয়েছে ভয়াবহ। এছাড়া কয়েক হাজার মাটির বাড়ির আংশিক বা পরিপূর্ণ ক্ষতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত চাষি ও বাড়িহারা মানুষের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়।

ওই দিন দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)-এর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকের ভেঙে যাওয়া বাড়িগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মেডিকেল টিম পাঠিয়ে দুর্গতদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে, স্বাভাবিক অবস্থা না ফেরা পর্যন্ত দুর্গতদের রান্না করা খাবার দেওয়ার বন্দোবস্ত, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমন ধান, পান, ফুল, সবজি চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিমা কোম্পানির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত মৌজাগুলির জলনিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তাগুলি অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নন্দ পাত্র, জেলা কমিটির সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, জ্ঞানানন্দ রায় প্রমুখ। অতিরিক্ত জেলাশাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট, সন্দেশখালি সহ নানা এলাকায় ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সাথে সাথেই দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান দলের কর্মীরা। মৃতদের স্মরণে শোকবেদি স্থাপন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

৮ ঘণ্টা শ্রমদিবস লঙ্ঘন করছে মোদি সরকার

দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের নিয়ম স্বীকৃত সারা বিশ্বে। তাতে সিলমোহর রয়েছে বিশ্ব শ্রমসংস্থার (ডব্লিউটিও)। কিন্তু সে সবকে লঙ্ঘন করে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ৯ ঘণ্টা শ্রম দিবস করতে চলেছে।

কার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত? শ্রমিকরা কি এই দাবি জানিয়েছে সরকারের কাছে? এই দাবি শ্রমিকদের নয়, মালিক শ্রেণির। ঘণ্টা পিছু মজুরি কমিয়ে মালিকদের মুনাফা বাড়াতেই সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। কেন্দ্রের বা রাজ্যের কোনও সরকারই এ পর্যন্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করতে পারেনি বা করার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু মালিকদের সুবিধা পাইয়ে দিতে সরকার অত্যন্ত তৎপর।

(তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ নভেম্বর ২০১৯)

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১৬)

বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদ ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর যে সময়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন কলকাতা শহর জুড়ে নবজাগরণের ঢেউ উঠে গিয়েছে। ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে এবং রামমোহন রায়ের সহায়তায় হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন সমাজে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ভিভিয়ান ডিরোজিও-র নেতৃত্বে শুরু হয়েছে 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন। ১৮৩৯-এ রামমোহন প্রবর্তিত ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামমোহন এবং ডিরোজিওর বিশিষ্ট অনুগামী ও শিষ্যদের অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বিদ্যাসাগরের অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য অক্ষয় দত্ত বিশেষ অনুরোধ করে তাঁকে এই পত্রিকার লেখা-নির্বাচন কমিটিতে থাকতে বলেছিলেন। ফলে, বাঙালি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট করার কাজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচুর সাহায্য করেছিল।

ছাত্রাবস্থা থেকেই বিদ্যাসাগরের কঠোর জীবনসংগ্রাম, অসাধারণ ধীশক্তি, পরিশ্রম করার বিপুল ক্ষমতা, সমাজের অবহেলিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা, সত্যনিষ্ঠা, প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ, স্বদেশপ্রেম, ভারতীয় সমাজ এবং শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান তাঁর চরিত্রের মজবুত ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ইউরোপীয় নবজাগরণের চিন্তাকে আয়ত্ত করেছিলেন। এই দুইয়ের সমন্বয়ই বিদ্যাসাগরকে সেই সময়ে সমাজ জুড়ে ছেয়ে থাকা অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মীয় তমসাচ্ছন্ন চিন্তার শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে সেকুলার মানবতাবাদের বার্তাকে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করতে সাহায্য করেছিল। রামমোহন বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে, তার ভিত্তিতেই ধর্মসংস্কার করতে চেষ্টা করেছেন, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দেননি। বিদ্যাসাগর চিন্তাক্ষেত্রে এই জায়গায় ছেদ ঘটালেন। তিনি বললেন, 'সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন হিসাবে ভ্রান্ত'। এইখানেই রেনেসাঁসের চিন্তার পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন আনলেন বিদ্যাসাগর। সেটি সেকুলার তথা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত পার্থিব মানবতাবাদ। এই চিন্তার মূল কথা— অন্ধ কুসংস্কার নয়, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা নয়, এর হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করার, যা কিছু যুক্তিভিত্তিক একমাত্র তাকেই গ্রহণ করার, জীবনে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার অঙ্গীকার। হাজার হাজার বছর ধরে কোনও একটা বিষয়কে সত্য হিসাবে জেনে এসেছি বলেই তাকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, এটা নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেই সত্যকেও প্রমাণিত হতে হবে এবং তারপরই তাকে জীবনে গ্রহণ করতে হবে। এর ভিত্তিতেই এসেছে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার চিন্তা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারীস্বাধীনতার ভাবনা-ধারণা। আগে ভাবা হত, মানুষের মনন ও বুদ্ধি অতিপ্রাকৃত অলৌকিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে নবজাগরণের চিন্তা বলল, অতিপ্রাকৃত শক্তি মানুষের বুদ্ধির জনক, এই ধারণা ভুল। মানুষের বুদ্ধিকে স্বাধীন করো। মনন ও বুদ্ধিকে অতিপ্রাকৃত সত্তার অধীনতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীস্বাধীনতার স্লোগান উঠল।

নবজাগরণের এই বলিষ্ঠ রূপটিকে ভিত্তি হিসাবে নিয়েই বিদ্যাসাগর সমাজ জুড়ে বিচারহীন বিশ্বাস, মান্ধাতা আমলের কুসংস্কার প্রভৃতি যা কিছু সমাজ অগ্রগতির পথে অনড় বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছিল সেই সব কিছুর বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নবজাগরণের এই উন্নত চেতনাকে দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার প্রসারে মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার ছত্রে ছত্রে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এই মন থেকেই তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নানা বিষয়কে— গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি সহজ-সরল করে তুলে ধরার জন্য 'বোধোদয়' রচনা করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যতালিকায় বিজ্ঞানকে আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে যুক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণের আগ্রহ বাড়ানোর উদ্দেশে বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের কষ্টবহুল জীবনসংগ্রাম তুলে ধরতে 'চরিতাবলী' এবং 'জীবনচরিত' নামে দুটি বই লিখে প্রচার করেন। দুরূহ ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ রচনায় নিজেই ব্রতী হয়েছেন সকলের আগে। অতল অনুসন্ধানই বিদ্যাসাগরকে করে তুলেছে বিজ্ঞানপ্রেমিক ও বিজ্ঞানমনস্ক। ১৮৫১ সালের শুরুতে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে আসীন হওয়ার পরই কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে 'নোটস অন সংস্কৃত কলেজ' নামে একটি রচনা শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তাদের কাছে পাঠান। তাতে অন্য অনেক পরিকল্পনার পাশাপাশি তিনি কলেজে সংস্কৃতে গণিত পড়ানোর বিরোধিতা করেন। বলেন, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোনও সার্থকতা নেই। কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রম অপব্যয় হয়। তিনি বলেন, সংস্কৃতের বদলে ইংরেজিতে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।

শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কারের কাজে নেমে বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, সমাজে অনড় হয়ে থাকা অন্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, প্রাচীনপন্থা ইত্যাদি মানুষের মনে কী মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। 'জীবনচরিত' বইতে কোপার্নিকাসকে নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, সুতরাং স্বয়ং তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেও, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল, পূর্বাচার্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোনও বিষয়, তাহার বিরুদ্ধতা বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান হইলে, তাঁহারা শুনিতে চাহিতেন না।" সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় প্রগতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে সমাদরযোগ্য করা রীতিমতো কঠিন। তাঁদের কুসংস্কারগুলি বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ়মূল। সেগুলি নির্মূল করা সহজ ব্যাপার নয়। কোনও নতুন তত্ত্ব, এমনকি তাঁদের নিজেদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে তারই বর্ধিত রূপ যদি তাঁদের গোচরে আনা যায়, তাও তাঁরা গ্রাহ্য করবেন না।' এই পশ্চাদপদতা, এই কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫১ সালে 'বোধোদয়' বইতে বিদ্যাসাগর লেখেন, "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোন বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। ...ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে, আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। ...ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হয়। অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, ভাল-মন্দ, হিত-অহিত বিবেচনার শক্তি জন্মে।" বিশ্বাসনির্ভর অধ্যাত্মবাদী চিন্তার বিপরীতে এভাবেই বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী শিক্ষা দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

এই সুকঠিন জ্ঞানসাধনার উদ্দেশ্য তাঁর কাছে ছিল একটাই— মানুষের চেতনাকে অন্ধবিশ্বাসের এঁদোগলি থেকে যুক্তিবিচারের বাঁধানো পথে নিয়ে আসা। এজন্য বিজ্ঞানবিষয়ক বইয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। নিজের লেখা বইপত্রেও এই বিষয়ে তিনি নানা আলোচনা করেছেন। অঙ্ক, পদার্থ এবং রসায়ন বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, শরীরতত্ত্ব, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনাকে সুখপাঠ্য বাংলা ভাষায় লিখেছেন বিদ্যাসাগর। অন্যদের এইসব বিষয়ে লেখার জন্য প্রচুর সাহায্য করেছেন। বিজ্ঞানের বহু বাংলা প্রতিশব্দ, যা আজও ব্যবহৃত হয় সেগুলি বিদ্যাসাগরেরই করা। গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সেই সময় লিখেছেন, "এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।" লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগর প্রচলিত 'জ্যোতিষশাস্ত্র' শব্দটি ব্যবহার না করে 'জ্যোতির্বিদ্যা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। 'জীবনচরিত' বইতে একবাক্যে 'কুসংস্কার'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে— "সমুচিত বিবেচনা না করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হয়।"

হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও বিদ্যাসাগর সাংখ্য-বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকিদের জন্যও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বার খুলে দেন, ইংরাজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন— কঠোর ধর্মীয় রক্ষণশীলতার সেই প্রবল দাপটের যুগে এইসব কর্মসূচি গ্রহণ করা কতটা কঠিন ছিল, আজকে তা ঠিকভাবে বোঝাও দুষ্কর।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষকদের জন্য মাঝেমধ্যেই তিনি প্রচুর বইপত্র আনাতেন। এমনকি ইংল্যান্ড থেকেও অসংখ্য বইপত্র আনাতেন। সেইসব বইয়ের তালিকা দেখলে চমকে উঠতে হয়। বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা-সমালোচনার কত রকমের বই রয়েছে সেই তালিকায়। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শিক্ষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি সহ জ্ঞানজগতের প্রায় সমস্ত শাখার বাছাই করা বইপত্র তিনি আনাতেন। সেগুলি ছাত্রদের, বিশেষত শিক্ষকদের পড়াবার ব্যবস্থা করতেন। বিদ্যাসাগর বলতেন, 'প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি— শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই।' এত শত-সহস্র বইপত্রের শুধু খোঁজই রাখতেন না তিনি, বরং সেগুলি পড়ে তার নির্যাস নানা সময়ে আলোচনা করতেন, সহজ-সরল ভাষায় অনুবাদ করে অন্যদের পড়তে দিতেন। এছাড়া ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ। কুড়ি হাজারেরও বেশি বই তাঁর সংগ্রহে ছিল। সমাজসংস্কারের অজস্র কাজে প্রভূত ব্যস্ততার মাঝেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দাগ দিয়ে দিয়ে বইপত্র পড়তেন তিনি।

বিদ্যাসাগর সে যুগের এমনই এক বিরল ব্যক্তিত্ব। এদেশে সামন্ততন্ত্রের মৃত্যুকালে, যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধতা, কুসংস্কার জনজীবনকে পিষে মারছে, সেই ঝড়ঝঞ্ঝাময় সময়ে বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয়। অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে, তাঁর যুগের উন্নততর জ্ঞানভাণ্ডারকে আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে, বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এদেশের সমাজ সম্পর্কে তিনি যা করণীয় হিসাবে মনে করেছেন, তা যেমন করেছেন, তেমনই যা সত্য বলে বুঝেছেন, তা প্রতিষ্ঠার জন্য আপসহীন সংগ্রাম করেছেন আজীবন। আর চলার পথে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন বস্তুবাদী যুক্তিনিষ্ঠায় উজ্জ্বল তাঁর প্রতিভাময় ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ। (চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

উত্তরকন্যা অভিযানে সামিল হাজার হাজার মানুষ

১১ দফা দাবিতে উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ভবন উত্তরকন্যাতে ১৩ নভেম্বর স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার তিন হাজারের বেশি মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে সুশৃঙ্খল মিছিল এয়ারভিউ মোড়ে পৌঁছয়। সেখানে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা, এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। তিনি বলেন, এ মিছিল নির্বাচনের লক্ষ্যে নয়, দাবি আদায়ের। এনআরসি-র নামে নাগরিকত্ব হরণের যে চক্রান্ত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার করছে, তিনি তার তীব্র সমালোচনা করেন এবং জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের উদাসীনতার নিন্দা করে আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস তপন ভৌমিক, শিশির সরকার, গৌতম ভট্টাচার্য এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী। মিছিল থেকে এক প্রতিনিধি দল উত্তরকন্যায় গিয়ে দাবিপত্র পেশ করে।

নবান্ন ও রাজভবনে স্মারকলিপি পেশ করলেন প্রতিনিধিদল

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, রাজ্যে মদ নিষিদ্ধকরা, নারী নির্যাতন বন্ধ, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য, চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, বিদ্যুতের মাশুল কমানো, নারী-শিশুপাচার বন্ধ, বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ে নিহত পরিবারবর্গের সাহায্য ও চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দাবিতে নবান্ন অভিযান এবং এন আর সি বাতিলের দাবিতে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশের উদ্দেশ্যে ১৩ নভেম্বর কলকাতার হেদুয়া পার্ক থেকে ২৫ হাজার মানুষের মিছিল শুরু হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে।

মিছিল থেকে দু'টি প্রতিনিধি দল নবান্ন ও রাজভবনে যায়। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী না থাকায় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভা ভবনে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবিপত্র গ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, তরুণ নস্কর, অনুরূপা দাস ও রূপম চৌধুরী। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শংকর ঘোষের নেতৃত্বে

রাজভবনে প্রতিনিধি দল

রাজভবনে রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন তরুণ মণ্ডল, পঞ্চানন প্রধান ও দেবাশিস রায়।

ভয়ঙ্কর বেকারি ও আর্থিক মন্দায় বিপর্যস্ত দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশার চিত্র রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরে প্রতিনিধিদল বলেন, এর উপরে এনআরসি-র আক্রমণ ভয়াবহ বিপদ হিসাবে নেমে আসছে। অবিলম্বে নাগরিকত্ব প্রমাণের এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। রাজ্যপাল এস ইউ সি আই (সি)-র এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি জানান, এই বক্তব্য উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবেন। বিধানসভা

বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে দাবিপত্র তুলে দিচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

ভবনে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতিনিধিদল দীর্ঘ সময় ধরে সমস্ত দাবি নিয়ে আলোচনা করে। তিনি দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করে মুখ্যমন্ত্রীকে সেগুলি জানাবেন বলেছেন। প্রতিনিধিদলকে পার্থবাবু বলেন, চিটফান্ড-ক্ষতিগ্রস্ত এবং বুলবুল ঝড়ে দুর্গতদের নামের তালিকা দিলে তিনি তাঁদের জন্য সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।

লাঠি, জলকামান মোকাবিলা করে জেএনইউ ছাত্রদের আন্দোলন জয়যুক্ত

জেএনইউতে লাঠি চালনার প্রতিবাদে ১২ নভেম্বর দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ

১১ নভেম্বর দিল্লিতে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) হোস্টেল-চার্জ অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়ানোর প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠি ও জলকামান নিয়ে নির্মম হামলা চালায় পুলিশ। ছাত্রদের ন্যায্য আন্দোলনের উপর এই বর্বর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র ওইদিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘরভাড়া ৩০ গুণ বাড়িয়ে বার্ষিক ২৪০ টাকা থেকে ৭২০০ টাকা করেছে। এর সঙ্গে দিতে হবে ১২ হাজার টাকা মেস সিকিউরিটি চার্জ, ২০ হাজার ৪০০ টাকা সার্ভিস চার্জ। এছাড়াও জল এবং বিদ্যুতের জন্য আলাদা চার্জ, এমনকি হোস্টেলের রাঁধুনি, ঝাড়ুদার, সাহায্যকারীর জন্যও চার্জ ধার্য করেছে কর্তৃপক্ষ। এর ফলে বেশিরভাগ ছাত্র হোস্টেল ছাড়তে বাধ্য হবেন। অবশেষে তাঁদের পড়াও ছাড়তে হবে। ছাত্র সংগঠন এবং নির্বাচিত বডিগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই কর্তৃপক্ষ একতরফা ভাবে 'হোস্টেল ম্যানুয়াল' পরিবর্তন করেছে। যার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা মুখর হলে আলোচনা দূরে থাক, কর্তৃপক্ষ একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে চলছেন এবং ছাত্রদের আন্দোলন ভাঙতে অপপ্রচার ও পুলিশি দমন নামিয়ে এনেছেন।

এআইডিএসও সমস্ত বর্ধিত ফি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা, হোস্টেল ম্যানুয়াল পরিবর্তন নিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশে আলোচনার দাবি জানিয়েছে। জেএনইউ ক্যাম্পাস সহ সর্বত্র ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি জানিয়েছে সংগঠন। জেএনইউ ছাত্রছাত্রীদের বলিষ্ঠ আন্দোলনের সামনে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। ১৩ নভেম্বর তারা ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই জয়ে এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটি আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com